গণমূখী পুলিশিং গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ:

জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম

মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়া গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বাংলাদেশ পুলিশ সর্বদাই এদেশের মানুষের জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে বদ্ধ পরিকর। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ পুলিশের আত্মত্যাগের অজস্র উদাহরণ রয়েছে নিকট অতীতে। আমি অত্র রেঞ্জে যোগদান করার পর থেকেই জনবান্ধব, ইতিবাচক পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে মেধাবী এবং আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সমৃদ্ধ পুলিশ কর্মকর্তাই বর্তমানে আমাদের বাহীনি প্রধান। তাঁর দেয়া নির্দেশনাসমূহ সামনে রেখে রাজশাহী রেঞ্জকে দূর্নীতি, মাদক এবং হয়রানীমুক্ত একটি মানবিক পুলিশ গঠনের লক্ষ্যে রেঞ্জের প্রতিটি ইউনিটে নির্দেশনা, উপদেশ এবং তদারকীর কাজ অব্যাহত রয়েছে। পুলিশি কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে সর্বস্তরের পুলিশ সদস্যদের বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি এবং বিভাগীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। থানার অফিসার ইনচার্জ পদায়নের ক্ষেত্রে তদবির কিংবা অন্য কোন অবৈধ প্রভাবকে উপেক্ষা করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে যোগ্য পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্বাচন করা হচ্ছে, ফলে রাজশাহী রেঞ্জের কর্মপরিবেশ এবং কাজের গতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০৪১ সালের আধুনিক পুলিশ বিনির্মানে রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশ বদ্ধ পরিকর। আধুনিক এবং প্রযুক্তি সমৃদ্ধ যে সকল নব-উদ্যোগ বর্তমান সময়ে গ্রহণ করা হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কিছু বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

অফিসার ইনচার্জ পদায়ন নীতিমালা-২০২০

থানার পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অফিসার-ইনচার্জকে অবশ্যই সততা, দক্ষতা ও প্রভাবমুক্ত থেকে পেশাদারিত্বের মনোভাব নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজশাহী রেঞ্জে পেশাদার ও দক্ষ অফিসার-ইনচার্জ নির্বাচনের জন্য একটি নীতিমালা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পুলিশ পরিদর্শকগণ রেঞ্জে যোগদানের পর তাদের জন্য একটি মূল্যায়নক্রম তৈরী এবং ক্রমানুযায়ী শীর্ষে থাকা পরিদর্শকগণকে অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে বিভিন্ন থানায় পদায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এতে করে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীগণ কোন প্রকার তদবীর ছাড়াই পদায়নের জন্য বিবেচিত হতে পারছেন এবং পদায়ন প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও সর্বগ্রহণযোগ্য হিসাবে সমাদৃত হচ্ছে। নতুন সদস্য তালিকায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর এটি পুর্নঃমূল্যায়িত হচ্ছে।

মূল্যায়নক্রম তৈরীতে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ঃ-

ক) জেলার পুলিশ সুপার'গণ ০৬(ছয়) মাস অন্তর ৯০(নব্বই) নম্বরের উপর মূল্যায়িত কপিটি রেঞ্জ ডিআইজির নিকট প্রেরণ করেন।

খ) শতকরা ৫০ ভাগ নম্বরের উর্ধ্বে প্রাপ্ত পরিদর্শকগণকে রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের নিকট উপস্থিত হতে হয়।

গ) ডিআইজি, ০২ জন অ্যাডিশনাল ডিআইজি, ডিআইজি কার্যালয়ের ০৪ জন পুলিশ সুপারগণের সমন্বয়ে গঠিত ০৭(সাত) সদস্যের বোর্ড উক্ত মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

ঘ) অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগ্য পরিদর্শকগণের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারকে অবহিত করা হয়।

ঙ) পরবর্তীতে উক্ত তালিকার ক্রমানুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে শুন্যতার ভিত্তিতে পদায়ন করে থাকেন।

মৌখিক পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের স্থির চিত্র।

অফিসার ইনচার্জ পদায়ন নীতিমালা-২০২০ ‘ছক’

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ক্রমিক নং	পুলিশ পরিদর্শকদের নাম, বিপি নং, নিজ জেলা, জন্ম তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান কর্মস্থল	বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-১০)		বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য (পূর্ণ নম্বর-৩৫)			পেশাগত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা (পূর্ণ নম্বর-৩৫)				অন্যান্য যোগ্যতা (পূর্ণ নম্বর-১০)		পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রদত্ত মোট নম্বর(পূর্ণ নম্বর-১০)	সামগ্রিক মূল্যায়ণ (ডিআইজি) (পূর্ণ নম্বর-১০)	মোট প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
		বয়স (পূর্ণ নম্বর-৫)	শারীরিক সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-৫)	ধীশক্তি ও মানসিক তৎপরতা (পূর্ণ নম্বর-১০)	শৃঙ্খলা ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য (পূর্ণ নম্বর-১০)	আর্থিক সততা (পূর্ণ নম্বর -১৫)	ওসি হিসাবে পূর্ব অভিজ্ঞতা (পূর্ণ নম্বর-৫)	নেতৃত্ব প্রদানে যোগ্যতা ও ব্যবস্থাপনা (পূর্ণ নম্বর-১০)	জনগণের সাথে মেশার সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-১০)	পুলিশি কাজে পেশাদারিত্ব (পূর্ণ নম্বর-১০)	ICT (কম্পিউটার জ্ঞানসহ CDMS, CIMS & PIMS) এর দক্ষতা (পূর্ণ নম্বর-৫)	পুরস্কার ও দন্ড (পূর্ণ নম্বর-৫)				
১.																

করোনা যুদ্ধে শহীদ দশ জন

করোনা অতিমারির শুরুর দিকে সবাই যখন হতবুদ্ধি, ভীত-বিহ্বল তখন কোনরূপ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঝাপিয়ে পড়ে পুলিশ। ঠিক যেমন ৭১ সালে আমাদের পূর্বসূরিরা থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাক হানাদার বাহিনী বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল রাজারবাগে। এর মূল্য দিতে হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশকে। রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের ১০ জন গর্বিত সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। গভীর শ্রদ্ধায় তাদেরকে স্মরণ করি। তাদের এই মহান আত্মত্যাগের ফলে করোনা নিয়ন্ত্রণ এসেছে, রক্ষা পেয়েছে দেশ।

করোনাভাইরাসে জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যবৃন্দঃ

পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোহাঃ সুমন আলী (৩৭) বিপি নং-৮৩০৮১২০৫১২, পিতা-মোহাঃ আব্দুল লতিফ, সাং-দৌলতপুর, থানা-শিবগঞ্জ, জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ। কর্মস্থল-নাটোর জেলা, বড়াইগ্রাম থানা।

পুলিশ পরিদর্শক জনাব ফজলুর রহমান (৫৭) বিপি নং-৬৩৮১০১০৩২৬ পিতা-মোঃ কাশেম, সাং তেরবাড়িয়া, থানা-ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল। কর্মস্থল-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর কোর্টে।

এসআই (সশস্ত্র)/৩১ মোঃ মোশারফ আলী (৫০), বিপি নং-৬৮৮৩০৯০০২৬, পিতা- মৃতঃ ফজল শেখ, সাং-নুরুদ্দিনপুর, থানা-সুজানগর, জেলা-পাবনা। আরআরএফ, রাজশাহী

এএসআই (নিঃ) মোঃ আবুল কালাম আজাদ (৩৫) বিপি নং-৮৬০৬১১৭৩১৪, পিতা-মোঃ আবুল কাশেম সরদার,সাং-বনিকপাড়া, থানা-শেরপুর,জেলা-বগুড়া। কর্মস্থল-রাজশাহী জেলার সদর কোর্টে।

এএসআই (সশস্ত্র/)/৫৫ মোঃ আব্দুল আলিম (৫২)বিপি-৬৮৮৮০০৩২০৩, পিতা-মৃত কফিল উদ্দিন বিশ্বাস, সাং-করশালিকা থানা-শাহজাদপুর , জেলা-সিরাজগঞ্জ। কর্মস্থল-পুলিশ লাইন্স নাটোর জেলা।

কনস্টেবল/৬৪৮ খন্দকার তৌফিক আলম (৫৮) বিপি নং ৬২৮১০৬৬৮০৩,পিতা-মৃতঃ মোলহেম উদ্দিন,সাং-মিরবেতকা,থানা ও জেলা-টাঙ্গাইল। কর্মস্থল-রাজশাহী জেলার ট্রাফিক শাখা

কং/৪৭৯ মোঃ রকিব উদ্দিন (৫৯), বিপি নং- ৬২৮১০৪৯২৪২ পিতা- দুধু মিয়া,সাং- বাজারপাড়া,থানা- গোমস্তাপুর,জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মোবাইল নং-০১৭১০-৯৪৫৮৪০ কর্মস্থল-নওগাঁ জেলার ট্রাফিক শাখা।

কং/৩৬৬ মোঃ আব্দুল মান্নান (৪৪) ,বিপি নং- ৭৬৯৬০৬৯৬৪১, পোরশা থানা, নওগাঁ। পিতা- মোঃ খায়রুজ্জামান সরকার, স্থায়ী সাং-দক্ষিণ হুড়াভায়াখাঁ, থানা-সুন্দরগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা। কর্মস্থল-নওগাঁ জেলার পোরশা থানা।

কনস্টেবল/১৬২১ মোঃ ফয়সাল আলম (৩৮) বিপি নং-৮২১১১৪২৬৬০,পিতা-মৃতঃ ইয়ার আহম্মেদ,সাং-রাণীনগর,থানা-গোদাগাড়ী,জেলা- রাজশাহী। কর্মস্থল-বগুড়া জেলার নারুলি পুলিশ ফাঁড়ি।

কনস্টেবল/৬৩ মোঃ আসাদুজ্জামান (৫২) বিপি নং-৬৮৮৮০৬৫৭৭৯, পিতা-আব্দুল লতিফ সরকার, সাং-উকিলপাড়া, থানা ও জেলা নওগাঁ। কর্মস্থল-পুলিশ লাইন্স জয়পুরহাট জেলা।

অথ পুলিশ গুণাত্মক কিংবা ঋণাত্মক বয়ান

জুলফিকার মতিন
অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পুলিশ নিয়ে কথা। কী বলব, ঠিক প্রত্যয় হচ্ছে না। একসময় পুলিশের সাথে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। সে আমার জন্মেরও আগে। আমার এক পিতামহ ১৯৪০ এর দশকে ময়মনসিংহ কোতয়ালি থানায় দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সূত্রে আমার পিতাও আনন্দমোহন কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। আমার বাল্যকালেই এই পিতামহ পরলোকগমন করেন। শৈশব স্মৃতি বলতে, তাকে সবাই দারোগা সাহেব বলতো শুধু এটুকুই মনে আছে। যতদূর বুঝতে পারি, তখনকার গ্রামীণ সমাজে, তাঁর এই পরিচিতি যথেষ্ট মর্যাদার ছিল।

আবার আমার কৈশোর কাল কেটেছে গ্রামে। তখন 'লাল পাগড়িওয়ালা'দেরই পুলিশ বোঝানো হতো। এই 'লাল পাগড়িওয়ালা'রা এলে গ্রাম প্রায় পুরুষশূন্য হয়ে পড়তো। বোঝাই যায়, ব্যাপারটা ছিল ভয়ের। কাকে ধরবে আর কাকে মারবে তার তো কোনো ঠিক নেই! তবে যেসব পুলিশ কর্মকর্তারা, বোধ করি, চোর-ডাকাত গুণ্ডা বদমায়েসদের পিটিয়ে দুরস্ত করে রাখতো, তাদের নামের খ্যাতিও গ্রামসমাজে প্রচারিত হতে থাকতো।

তাই পুলিশ সম্পর্কে কী লেখা যায়, তা নিয়ে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়াটা, বোধ করি অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া কোনটা প্রশংসার হবে, আর কোনটা বা মানহানির, সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারছি না। প্রমথ চৌধুরী একটা কথা বলেছেন, তা হলো, তিনি যখন সত্য কথা বলেন, লোকে মনে করে কৌতুক। আর তিনি যখন কৌতুক করে বলেন তখন লোকে ভাবে সত্য। তাই আমার কথাও কে কিভাবে নেবে তা একটু প্রশ্ন-সাপেক্ষ বটে। কৌতুককে সত্য বলে ধরে নিলে মহা বিপত্তিও ঘটে যেতে পারে। আপনারা তো সুকুমার রায়ের ছড়া পড়েছেনই, 'রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা'।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। এক সঙ্গে বসবাস করতে গেলে ব্যক্তি মানুষকে স্বআরোপিত অনুশাসনের ভেতরে থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতাই বলি আর ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষাই বলি, সেখানেও রাশ টেনে ধরতে হয়। এই প্রক্রিয়ার ভেতরে নিজের অনেক কিছুই যেমন বিসর্জন দিতে হয়, তেমনিভাবে অন্যের অনেক কিছুকেই গ্রহণ করার প্রশ্ন আসে। এভাবেই সমাজটাকে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটা আসলে সামাজিক মানুষের মধ্যে মঙ্গলামঙ্গলের ধারণাও তৈরী করে। এই মঙ্গলামঙ্গলের বোধ থেকেই নৈতিকতা ও অনৈতিকতার বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অনৈতিক কাজকর্ম, চুরি-ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা খুনজখম ইত্যাদি করে তখন তাদেরকে আইনের আওতায় আনার প্রশ্ন আসে। এ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারটিও এসে যায়। যার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাতে বর্তমান সময়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। আগের দিনের রাষ্ট্র ছিল পরিবারতান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক। তখন এ সবের বালাই ছিল না। সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক ছিলেন সম্রাটই বলি আর রাজা মহারাজা যাই বলি তারা। তাদের ক্ষমতার উৎস ছিল মূলত সামরিক শক্তি। তাদের নিযুক্ত জায়গীরদার মসনবদারেরা প্রধানত এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজটি করত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে, – জনগণকেই যখন রাষ্ট্রের মালিক বলে বিবেচনা করা হতে থাকে, তখন এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করাটা আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে না। তার একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গড়ে উঠতে থাকে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে এই নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূচনা ঘটে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন কালে। তাদের আগে অনেক বাহিরাগত জাতি এসেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও বিভিন্ন জাতির মুসলমানেরা প্রায় সাতশ বছর এদের শাসন করেছে। কালে কালে তারা আর বহিরাগত থাকেনি। গড়ে তুলেছে স্থায়ী বাসস্থান। গ্রহণ করেছে এদেশীয় স্ত্রী। এভাবে বংশবৃদ্ধির ভেতর দিয়ে হয়েছে এদেশের জনসমষ্টির অংশ। কিন্তু তাদের সময়ে উৎপাদন ব্যবস্থার নিরিখে সমাজে কোন গুণগত পরিবর্তন আসেনি। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা আর অদৃষ্টবাদী জীবন ছিল গড় চালচিত্র। বৃটিশ আগমনের পর পরিবর্তন আসে উৎপাদন ব্যবস্থাতে। ধনতান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নিগড়ে একসূত্রে বাঁধা পড়তে থাকে গোটা দেশ। এরই পাশাপাশি ইহজাগতিক মানবতাবাদী দর্শনের যেমন বিস্তার ঘটতে থাকে, তেমনি বৌদ্ধিক চিন্তাচেতনার উন্মেষও ঘটতে থাকে তাদের আনীত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায়। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন স্থাপিত হয় তেমনি অফিস আদালত হাসপাতাল ইত্যাদিও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এর ফলে যেমন সূচনা ঘটে নগরকেন্দ্রিক জীবনের, তেমনি সংঘটিত হয় চাকরিজীবী পেশাজীবী সম্প্রদায়ের। আজকের দিনে আমরা যে ডাক্তার উকিল

শিক্ষক কেরানী পিয়ন ইত্যাদি নিয়ে যে পেশাজীবী মানুষদের দেখতে পাই তারও সূচনা ঘটে এখান থেকে। থানা-পুলিশও তার ব্যতিক্রম নয়।

অধিকার বিস্তার পর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাদের অধিকৃত এলাকা পরিচালনার জন্য একজন গভর্নর জেনারেলের নিয়োগ দেয়। এই গভর্নর জেনারেলের শাসনকালের মেয়াদ হতো পাঁচ বছর। এখানে যেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, পূর্বেকার সম্রাট– সুলতানেরা যেমন সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, কিংবা প্রতিপক্ষ দ্বারা নিহত অথবা উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকত, সেখানে ব্রিটিশরাই একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ,– পাঁচ বছর বেধে দেয়। মেয়াদ শেষ হলে আবার নতুন নিয়োগের নিয়ম চালু করা হয়। এতে ক্ষমতা আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে না। এই নতুন শাসনব্যবস্থার অবতারণা হলে, বৃটিশরা অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো, পূর্বেই বলেছি, থানা-পুলিশের প্রবর্তন করে। তা থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা হয়, বোধ করি, তার ধারাবাহিকতা আমরা এখনো বহন করছি।

এখন কথা হল, রাষ্ট্রকে যদি 'নেসেসারি এভিল' বলা হয়, তার হয়ে যারা আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের কাজ করছে, কিংবা সেই রাষ্ট্রকর্তাদের ক্ষমতা বহাল রাখার কাজে নিয়োজিত, তাদের কর্মকাণ্ড কেমন হতে পারে, তাও ভেবে নিতে দোষ কি! তার পরিচয় তো আমরা বৃটিশ আমলেই দেখেছি। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা একদিকে যেমন নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করেছে, অন্য দিকে সেই আইন প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করেছে পুলিশ বাহিনী। এটা ঠিক, বৃটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেই সিভিল ভ্যাল্যুজের তৈরী হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিতার বদলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ পরিপ্রেক্ষিত নতুন সংস্কৃতিরও জন্ম দেয়। এজন্য একটি উদাহরণ দেওয়াই, বোধ হয় যথেষ্ট হবে। এটা দেখা গেছে যে, অপরাধী ধরতে অথবা বাড়ী সার্চ করতে এসে, সারারাত ধরে পাহারা দিয়ে সকালবেলাতে যখন বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছে তখন পাড়াপ্রতিবেশীদেরও সঙ্গে রেখেছে সাক্ষী হিসেবে। কিন্তু তারা তো এসেছিলো এদেশ শাসন করতে– শোষণ করতে। পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিলো দেশবাসীর পায়ে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কারণে দেশীয় পুঁজি বিকাশেরও পথ ছিলো রুদ্ধ। একটি জাতি তো এভাবে পরাধীনতার শিকলে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা– স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। তাই যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলো তখন তা দমন করার জন্য প্রধানত পুলিশ বাহিনীকেই নিয়োজিত করে। সে সময় স্বাধীনতাকামী মানুষদের দমন করার জন্য পুলিশদের ব্যবহার করে তখনকার হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে ঢোকানো হয়েছে জেলের ভেতর। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী অসহোযোগ ও খেলাফত আন্দোলন ও ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের সময় তাদেরকে জেলের ভেতরে ভরার জায়গাও ছিল না বলে শুনি। মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ কিংবা লিয়াকত আলি খানদের অবশ্য কখনো জেলে যেতে হয়নি। কিন্তু কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখেরা দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে কারাভোগ করেছেন। তা থেকেই, বোধ করি, জেলে না গিয়ে নেতা হওয়া যায় না, একথার চল হয়ে গিয়েছিল। এই গণবিরোধী ভূমিকার জন্য 'হুকুমের দাস' হলেও, আমার মনে হয় পুলিশ কিংবা পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে সাধারণভাবে তৈরী হয়েছে একটি বিরূপ ধারণা।

পাকিস্তান আমলেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। এটা ঠিক যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। বাঙালী মুসলমানেরা ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল একটি নতুন রাষ্ট্রে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্ত তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বরং দেখা গেল ধর্মের নামে জাতিগত নিপীড়নের ভয়াবহতা। এক তো ছিলো পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা। রাজনৈতিক ক্ষমতাও কুক্ষিগত হলো মুসলিম লীগের পশ্চিমা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বারা। বৃটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারায় দেশটি পরিচালনার কথা বলা হলেও তা ছিলো ঘোষণা মাত্র। এজন্য যে উদাহরণটি যথেষ্ট, তা হলো ১৯৭০ সালের পূর্বে সারা পাকিস্তানে একটি সাধারণ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গে ১৯৫৪ সালে যে প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচন হয় তাতে ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করে যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের কারণে যুক্তফ্রন্টকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। এরপর এল ১৯৫৮ সালের আইয়ুব খানের সামরিক শাসন। কেড়ে নেওয়া হলো সার্বজনীন ভোটাধিকার। পাকিস্তানী এই শাসনের বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল তাই পর্যায়ক্রমে অনেক আন্দোলন অনেক আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত অনিবার্য করে তোলে মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব ও পশ্চিম অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য হয়ে দাঁড়ালো পাহাড় সমান। পাকিস্তানী এই শাসনের বিরুদ্ধে ভাষাকে কেন্দ্র করে যে বিস্ফোরণ শুরু হলো, তাই পর্যায়ক্রমে অনেক আন্দোলন- অনেক আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত অনিবার্য করে তোলে মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালীর এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তান সরকার প্রধানত ব্যবহার করেছে পুলিশ ও পুলিশ বাহিনীকে। বঙ্গবন্ধু তো বটেই, তখনকার অন্য নেতারা– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখেরা জেল খেটেছেন। আমি স্বকর্ণে শুনিনি, তবে আমার ছাত্রাবস্থায় পুলিশ সম্পর্কে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর একটি কথা বেশ চালু হয়ে গিয়েছিলো, তা হলো, 'পুলিশ তুমি যতই মারো, বেতন তোমার একশ বারো'। এসব থেকে পাকিস্তান আমলেও পুলিশ ও পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে মানুষের ধারণা কেমন ছিলো তা মনে হয় অনুমান করা যায়।

তবে, এখন তো আর পরাধীনতা নেই। বৃটিশরা চলে গেছে। পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হয়েছে। সুতরাং একটি স্বাধীন দেশে পুলিশ ও পুলিশ বাহিনীর সদর্থক নতুন ভূমিকা প্রত্যাশিত। শক্তি চট্টোপাধ্যায় যদিও কৌতুক করে বলেছেন, 'পুলিশেও গাহিল রবীন্দ্র সংগীত'। কিন্তু সত্যি সত্যি পুলিশকেও রবীন্দ্র সংগীত গাইতে হবে। তার অর্থ জীবন ও সমাজের পজিটিভ যে পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে, তা সৃজন ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব তাদের ওপরেও বর্তায় বৈকি। মানুষের জীবনের প্রথম দাবী তার নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার ভেতর দিয়েই প্রবাহিত হয় সুস্থিরতা। একেবারেই সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু খবর পড়েছি, তাই বোধ করি এর পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যেমন, (ক) ঝিনাইদহের এক পুলিশ কর্মকর্তার মানবতার পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি পুরস্কারের টাকা নিহতের পরিবারকে প্রদান করেছেন(দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩রা সেপ্টেম্বর ২০২১)। (খ) মঠবাড়িয়া উপজেলায় দ্বিতীয় বিবাহ করে অন্যত্র গমন করায় তার প্রথমা স্ত্রী দায়িত্বহীন স্বামীর ঋণের জামিনদার হয়ে গ্রেফতার